৫। "বিহারীলাল যতটা ভাবুক ছিলেন ততটা ভাব ছিলেন না।" — সারদামঙ্গল কাব্য অবলম্বনে বিহারীলাল সম্পর্কে এই মন্তব্যের যথার্থতা বিচার কর।

বিহারীলাল চক্রবর্তী বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম খাঁটি গীতিকবির রূপে চিহ্নিত হয়ে আছেন, আত্মগত ভাব ও ভাবনাকে তিনিই প্রথম নিজস্ব ছাঁচে ঢালাই করে উপহার দিয়েছেন, তাঁর প্রাণের কল্পলোকের এই মধুর চেতনা প্রকাশিত 'সারদামঙ্গল' তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা, রবীন্দ্রনাথ এই সারদামঙ্গল পাঠকরে অভিভূত হয়েছিলেন এবং বিহারীলালকে বাংলা কাব্যের বিশুদ্ধের প্রথম 'ভোরের পাখী' বলে উল্লেখ করেছিলেন, তবু সারদামঙ্গল কাব্য সম্পর্কে নানা অভিযোগও উঠে এসেছে, কেউ কেউ মনে করেন বিহারী লালের সারদামঙ্গল কাব্য বাল্মীকি জন্মলাভের ফল কাব্যরূপ, বিহারীলাল যতটা ভাবুক ছিলেন ততটা ভাবুক ছিলেন না, আবার কেউ বলেন কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন যে সারদামঙ্গল আনন্দময় গীতি কাব্যের সর্বাধিক বাধা, যদি তাঁর মনের গভীর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে গিয়ে সৃষ্টির পারম্পর্য তেমন রক্ষা করতে পারেন নি, প্রকৃতপক্ষে সারদামঙ্গলের এই সম্পর্কে এইসব মন্তব্য করাটা অযথা নয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "পুরাণই কাব্য" কল্পনা কবির মনের বস্তু কিন্তু তাকে সার্থকভাবে প্রকাশ করতে না পারলে সার্থক কবি হওয়া যায় না, প্রবল কল্পনা থাকলেও যদি তাকে উপযুক্ত ভাষা - ছন্দ - অলংকার সাজিয়ে তোলা না যায় তবে তা পাঠকের হৃদয়কে সার্থকভাবে নাড়া দিতে পারে না, প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন, সাহিত্যিককে হলেন বাদক তাঁর মন হল্যাজিনেশন তারে সৃষ্টি করেন, যাতে পাঠকের হৃদয় যন্ত্রের ভেতর তা বাজিত সুর ও ঝঙ্কার জাগিয়ে তুলতে পারে, বিহারীলালের কবি কল্পনার মধ্যে নতুনত্ব এবং অসাধারণত্ব ছিল কিন্তু সেই অসাধারণ ভাব ও ভাবনাকে কবি উপযুক্ত ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন নি,

প্রকৃতপক্ষে সারদা সম্পর্কিত বিচার গুলো একান্ত বিষয়বস্তু, তবে এই সারদা কবির মধুময় ভাবনার আকর হয়ে উঠেছেন, এই সারদার সঙ্গে তাই দেখানো কবি কবির ও মিলনের কথায় পূর্বাপর (আখ্যান) বিষয়রূপে লেখা দিয়েছে, সারদা কখনও কখনও আবার হয়,

আজও অন্তর্হিত হয়ে আছে। তাঁর অন্তর্ধানে আজকের দীন-হীন পূর্ণ পূজারীদের মধ্যে যখন সারদাকে খুঁজেছিল, তখনকার সৌন্দর্যসাধনী।

এইজন্য কবিতার ভাব ও বিষয় পাঁচালি ছন্দে কবি তাঁকে তুলে ধরেছেন। এই পাঁচালি সর্গের মধ্যে ভাব-কল্পনা সর্বত্র ঘটতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ নয় করেছিলেন, সুমিত্রা দেবীর সোনার মন্দিরে লেখাটাকার মত। সারদামঙ্গলের সোনার প্রতিমাগুলি নানা রঙের আলোয় যেন একটু ঝলমলে ছায়াভাবে ধারণ করে রাখেনি। তিনি সুদূর সৌন্দর্য স্বপ্নলোকে মানস অপূর্ব পূরবী রাজকন্যা পুনরায় করে মনের কাছে তুলতে পারেন। তার ফলে সারদামঙ্গল পাঁচ সর্গ বিশিষ্ট প্রবন্ধ অথচ গীতি কাব্য নামকরণ ধ্রুপদী গীতি কবিতার সমষ্টিরূপে কথা বলেছে। এর অর্থ সমগ্র কাব্যের ভাব প্রবাহকে মনের অধ্যক্ষ কবি সুক্ষ্ম করে রাখতে পারেন নি। অনেকসময়ই কবির ভাবের প্রাবল্যে টুকরো টুকরো ছবিগুলি পূর্ণাবয়ব ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। সারদামঙ্গলের সতরো ভাব বাধারায় কবি লোকের ক্ষমতা না থেকে, ভাবনার মধ্যে কোন অখণ্ড সংগতিগুণ নেই।।

দ্বিতীয়ত, সারদামঙ্গল কাব্যের ঘটনাগত অংশও নানাদোষে কবির অসতর্কতা দোষে পড়ে। কবিতা বা সাহিত্য শব্দেরই শব্দাশ্রিত। বঙ্কিমচন্দ্র হয়ত বলেছিলেন যে ভাব পূজারীদের কাছে দেবতার ধ্যানের শব্দ পুরোপুরি ছাড়া চলতে পারে। তবে রবীন্দ্রনাথ কবি প্রতিভাও লিখেছিলেন যে, শুধু ভাল ভাল শব্দের সান্নিবেশেই কবিতা লেখা হয়না, ভাল শব্দ কিংবা ভাল ভাল শব্দ কবিতায় ব্যবহার করে কিন্তু ব্যবহারের গুণে শব্দের ভালো মন্দোত্বের ভেদ ঘুচে যায়। আসলে শব্দের সঙ্গে শব্দের মিলে মেশানো ভাব সহজে স্বচ্ছন্দভাবে এবং সুন্দরভাবে প্রকাশ পেতে পারে সেখানেই শব্দ পুরোপুরি স্বার্থক। কিন্তু বিহারীলাল অমিত্রাক্ষর ভঙ্গির বলে শব্দ পুরোপুরি ভেঙে তাঁর দুর্বোধ্য পুনরাবৃত্তি করেছেন। যেমন —

"হে দেবি বলিয়াছেন কাতরে কাতরে" কিংবা

"অয় অয় ওহো ওহো কি ময়ান সমারে"

ঘোরতর মহাচ্ছটা ভেদে ধরার

এই সবক্ষেত্রে শব্দ ব্যবহারের তার দুর্বলতায় প্রকাশ পেয়েছে, কেননা কবিতার ভাষা সাধারণ ও লঘু ধর্মী হয়ে পড়েছে, আবার কেবলমাত্র অনর্থক 'ওহো ওহো' জাতীয় শব্দের প্রয়োগ সুষ্ঠুভাবে কোন ভাবকল্পনা সৃষ্টিতে পারেনি, অর্থাৎ কোনোমতে কবি এমন একটী লঘু ভাবে অভীষ্ট হয়ে পড়েছিলেন যে তাতে ও প্রকাশ করতে ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু সুন্দর ভাবকে ধারণ করে নেননি, কবিতাটি মাঝে মাঝে আধুনিক ব্যঙ্গকবির আদর্শের স্পর্শ পড়ে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে, যেমন —

"নিটোল সুডৌল পাটী নদীর শরীর" অথবা,
"মস্ত মস্ত তুবড়ি ফোটে ফোটে ফুল" — এই জাতীয় ভাষার ব্যবহারে কোন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়ে উঠতে পারেনি, আসলে বিলাতীয় ফ্যাশনের যে শব্দ প্রয়োগ তেমনি বিহারীলাল ঠিকমত মেলাতে পারেন নি।

রবীন্দ্রনাথ কাব্যের উপকরণের মধ্যে অলঙ্কারের কথাও উল্লেখ করেছিলেন, অনেক সময়ই আনর্কচনীয়তাকে রূপদিতে অলঙ্কারের দরকার হয়, তাছাড়া অলঙ্কার মানুষের চিরকাল স্বাভাবিক ভাবের উপরে সুন্দরের তেল মাখে অনুভবেরই প্রকাশের জন্য বেড়ে পাটকে — বিচুন করে নেলে, বিহারীলাল সার্থক যে অলঙ্কার ব্যবহারে অসমান করেছেন তা নয় কিন্তু অলঙ্কার নির্মাণে তাঁর দুর্বলতা অনস্বীকার্য, প্রথমত, অধিকাংশ চিত্রকল্পের ব্যবহারে তার শিল্পরীতির ব্যঞ্জনা প্রকাশ করেছেন, আসলে Abstract কেবলই Concrete করে তোলার কবির লক্ষ, তাঁর সকল কবিতাতেই সম্ভবপর, কিন্তু বিহারীলাল অনেক ক্ষেত্রে চিত্রকল্পের ব্যবহারে রীতিরীতির ব্যঞ্জনা ব্যক্ত করেছেন, যেমন — প্রথম সর্গের দ্বিতীয় অংশে উষার কারণে বিশ্বে রঙের লিখনে,

"তাঁকে আমার গলা দাঁড়ায়ে উদয়াচলে" অথবা সৌন্দর্যলক্ষ্মীর আগমনে লিখেছেন, "নীল গগনে মনোহর সুবর্ণ নলিনী"

এই সবছাড়া ভাবসম্পদে পূর্ণ হলেও কাব্য নির্ভর নয়। আসলকথা কবি নিজেরভাবে এত মশগুল হয়ে পড়েছিলেন যে কোনো খেয়াল রাখেন নি যে তাঁর কাব্য পাঠকের জন্য রাখে

হচ্ছে, সকলে নিশ্চয়ই লেখক, নিজেই স্বেচ্ছায়াসে কোন সমস্যার কারণে মন্ত্রী নিজস্ব হয়ে লিখেছিলেন যে একটী সুন্দর শব্দমূর্তি তে কোথাও পাঠকের সামনে দাঁড়াতে পারেনি।

সারদামঙ্গলের ছন্দ সর্বত্র নিখুঁতভাবে ব্যবহার করার ফলের মেতে অবশ্যই দীনতরই ছাপ্পি একটা ছাপ আছে, তাছাড়া রচনারও হয়ত কিছু ছাপ আছে কিছু ছন্দের উপর কাজ করার অভাবেও সম্ভবতঃ কোথাও কোথাও মনে হয় দীন প্রকাশ ও ধ্বনি প্রকাশ জোরালো না হতে পারাটাও মনকে তা সহজে সহজেই আকৃষ্ট করতে পারে। বিহারীলাল সর্বত্র তা পারেন নি। প্রথমে যে কথাটি বলা হোল তাহল আকর্ষণ করতে পুরোপুরি করার জন্য বিহারীলাল ছন্দে বহুরূপ আনতে পারেন নি। কারণ তাঁর ছন্দ রচনায় অতি সর্বত্র প্রবহমানতা সৃষ্টি করেনি, কিন্তু জায়গায় জায়গায় যতি ছন্দকে অপরূপ করে তুলতে পারেন নি, তাঁর ছন্দে সর্বত্র পরিপূর্ণ ধ্বনি ও তরঙ্গিত ভাব অনুভব করা যায় না, মধ্যবর্তী মিলের ক্ষেত্রেও তাঁর অমনোযোগিতা জায়গায় জায়গায় পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। যেমন - যেমন অনুরেখা / কে দুয়েছিল দান

এখানে রেখা এবং দান এই দুটি শব্দের অন্ত্যানুপ্রাসের দুর্বলতা কবির ছন্দের প্রকাশকে অনেকাংশে বাধা দিয়েছিল। অথবা যখন কবি লেখেন, এত যে যন্ত্রণা জ্বালা / অবসান অবহেলা —

এখানে জ্বালা এবং হেলা এই দুইয়ের মেতে ধ্বনিগত অমিল কিছু থাকলেও পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে।

সেইজন্য বলাযায়, বিহারীলাল বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ গীতি কবি এবং তাঁর সারদামঙ্গল গ্রন্থই আধুনিক কাব্য গুণ-বিচারে ও ভাবনায়, কিন্তু সেই বিষয়ে যে বাংলা রূপায়িত করার জন্য কবি যথেষ্ট যে নিষ্ঠা-চেতনার প্রয়োজন ছিল বিহারীলাল ক্ষেত্রেতে অনেকটা অভাব-ধারণা পোষণ করেছেন, মানসী কাব্যেতে বাস্তবের সাথে সাথে তিনি ধারণাকল্পনা সার্থক ভাবে বজায় রাখতে পারেননি, এইজন্যই বলাযায় যে (তিনি) বিহারীলাল গভীর বোধ অনুভব করেছেন ঠিকই, কিন্তু সেই ভাবকে যথাযোগ্য রূপ দিতে যে প্রয়োজন ছিল ঠিক ততখানি —

প্রাণভরে পালিয়ে -জ্ঞান রাখতে পারার মধ্যে অর্থনীতি শুধুমাত্র সময়
নষ্ট হচ্ছেনে উত্তর ক্ষয় হচ্ছেনে না।

Scanned by TapScanner